মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার প্রভাব

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১

মধ্যযুগে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল ; ছিল শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, নানান লোকধর্ম, নানান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত ছিল বহু রকমের দেব-দেবীর পূজা, যেমন ধর্মপূজা, মনসাপূজা, চন্ডীপূজা, শীতলা ও ষষ্ঠীদেবীদের পূজা ; ছিলেন পঞ্চানন্দ, ব্রহ্মদৈত্য, বাবাঠাকুর, ছিলেন পীর। সবার উপরে ছিল ব্রাহ্মণ্য স্মার্ত সংস্কার এবং কৃত্যসমূহ, যা সম্ভবত সেন রাজাদের সময় থেকেই ধারানিবদ্ধ হয়ে আসছিল।

এসব ধর্মবিশ্বাসের পরিমন্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম, চৈতন্যের এবং তাঁর অনুগামীদের কিছুটা সংগঠিত ক্রিয়া-কলাপের ফলে, বিশিষ্টতা অর্জন করে। মধ্যকালীন বঙ্গ-সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে বৈষ্ণব ধর্মকে জানতে হয় ; বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গির, এবং জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

২

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব বর্ণের একাধিক স্তর ছিল।[১] গুপ্ত-সম্রাটদের সময় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈষ্ণব উপাসনা পঞ্চোপাসনার অঙ্গ হলো ; অর্থাৎ, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য উপাসনার মধ্যে বৈষ্ণব উপাসনাও বিশিষ্ট হয়ে উঠল। তার আগেই প্রচারিত হয়েছিল বৈষ্ণব অবতারবাদ। বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বের মতো অবতারও অসংখ্য ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রধান দশাবতার ; এবং দশাবতারের মধ্যে একজন বুদ্ধদেব। বৈষ্ণবরা অন্যান্য প্রধান ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যথেষ্ট সহনশীল ছিলেন। কলহ বিবাদের নিদর্শন থাকলেও, দেখা যায়, বৈষ্ণবরা অন্য ধর্মবিশ্বাসে উপাস্য দেবতাদের সঙ্গে সব

১. দ্রষ্টব্য : রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), 'দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', প্রথম খণ্ড (পাটনা সংস্করণ, ১৯৭১), পৃ. ৪০০ ; শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, 'দ্য বৈষ্ণব কাল্ট', রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, মনোগ্রাফ নং ৪, জুলাই ১৯৩০ ; এস. সি মুখার্জি, 'এ স্টাডি অফ বৈষ্ণবিজম ইন এনসিয়েন্ট এ্যান্ড মিডিয়াভাল বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৬৬।

সময়ে আপসের চেষ্টা করেন ; যেমন : ইন্দ্রের ছোটো ভাই উপেন্দ্র অথবা কৃষ্ণ ; সূর্য আসলে বিষ্ণু ; সাযুজ্য-গ্রন্থিত হরিহর ; বুদ্ধাবতার ; বৈষ্ণব ব্যূহবাদের সামঞ্জস্য ; ইত্যাদি। শিলালেখ এবং তাম্রলেখসমূহ থেকে জানা যায় যে, গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে সেনযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈষ্ণব অবতার-পূজার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষভাবে স্থানীয় আমলাতন্ত্র, এবং পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও কৃষকগণ অবতারদের উপাসনা করতেন। অবতার পূজার প্রভাবে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিছুটা কমে যায়।[২] তারণকর্তারূপে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর কোনো অবতার, যথা নৃসিংহ বরাহ, কিংবা কৃষ্ণ, জনপ্রিয় হন।

বৈষ্ণব ধর্ম উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঐতিহ্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বুদ্ধকে অবতার-রূপে গ্রহণ করলেও, বৈষ্ণবরা কখনো বৌদ্ধধর্মের নামে দৈত্য-পূজা মানেন নি। ওদিকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা নাথসিদ্ধবৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত শৈব-শাক্ত ধর্মকে 'পাষণ্ড' মতবাদরূপে বিচার করেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মকে মেনে নেন।[৩] একদিকে যেমন বৈষ্ণবরা অহিংসা এবং সদাচার পালনের মাধ্যমে উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণদের কাছে গ্রাহ্য হলেন, অন্যদিকে রামানুজাচার্যের চেষ্টায় বেদান্তের বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—প্রচারিত হলো। প্রায় একই সময়ে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত পৌরাণিকগণ সম্মিলিতভাবে রচনা করেন সমন্বয়মূলক 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' এবং পরে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'। এ-সব পুরাণে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব কাহিনী সমূহ সমন্বিত, সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক পুরাণও রচিত হলো, যেমন, বৈষ্ণবদের 'ভাগবতপুরাণ', শৈবদের 'শিবপুরাণ', শাক্তদের 'দেবীপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ'।

পুরাণের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। বিষ্ণু উচ্চ দেবতা ; 'ত্রয়ী'র মধ্যে একজন। তাঁরই গোপবেশধারী এবং বংশীধর অবতার কৃষ্ণ, তিনি চিরকুমার ; তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত যৌন আকর্ষণ দুষ্প্রতিরোধ্য ; তিনি গোপীবল্লভ ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্ধর্ষ বীর, এবং দানবারি। যৌনতা ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ ব্যবহারে ; ছিল শিবের লিঙ্গরূপী প্রতীকের পূজনে ; ছিল শাক্ত তান্ত্রিক সাধনায়। কিন্তু যৌনতার এ-সব ভাববাদ, এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত 'রহস্যজনক পদ্ধতি', সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল কি-না সন্দেহ। সম্প্রতি রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে, যৌন তান্ত্রিকতার প্রধান

২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, "বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য কীর্তি", যোগেশনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বিক্রমপুর', ১৩২০ (১৯১৩), পৃ. ১৮৪।

৩. দ্রষ্টব্য : বল্লালসেন, 'দানসাগর' (ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৫, ১, পৃ. ৬-৭।

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উন্মার্গগামী কিছু রাজাগজা ধরনের লোক।[৪] তাঁদের অর্থেই নির্মিত হয় খাজুরাহোর, এবং কনার্কের মন্দির। কিন্তু কৃষ্ণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি প্রধানত প্রেমিক; এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ সমাজের রক্ষক। তারপরে তিনি দেবতা। এভাবে পরিকল্পিত অন্য কোনো দেবতা ছিলেন না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'প্রেমিক' কৃষ্ণের প্রভাব যতই বাড়তে থাকল, শিব ততই বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, স্ত্রী-নির্জিত কৃষকরূপে পরিস্ফুট হতে থাকলেন। চণ্ডী থেকে উৎসারিত হলেন মনসা, শীতলা, বাসুলি, ষষ্ঠী, বনবিবি, পোড়া মা। শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ধর্ম। কিন্তু, প্রেমিক কৃষ্ণের কোনো রূপান্তর ঘটল না; অবহট্ট সাহিত্য কৃষ্ণকথায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সম্ভবত তারই প্রভাবে জয়দেব উপহার দিলেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ'; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা লিখলেন প্রায় একাত্তর জন কবি।[৫]

ক্রমবর্ধমান যৌনভাবাত্মক তান্ত্রিকতা; দেবতার নাম করে, স্মৃতিশাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আদিরসাত্মক কাব্য রচনা; শিল্পে মৈথুন প্রদর্শন; ধর্মের নামে ব্যভিচার; এ-সব, ঐতিহাসিক পানিক্কারের মতে, ছিল হিন্দু-সভ্যতার শোচনীয় অবক্ষয়ের লক্ষণ।[৬] তারই সুযোগ নিলেন মূর্তিধ্বংসী ধর্মের নামে অনুপ্রাণিত বৈদেশিক মুসলমানগণ; সহজেই তাঁরা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেন। আরও একজন ঐতিহাসিক 'হিন্দু'-ভারতের পতনের জন্য বৌদ্ধ, জৈন, এবং বৈষ্ণব 'অহিংসা'কে দায়ী করেছেন। এই মত অবশ্য বিতর্কিত।[৭]

৩

পৌরাণিক কৃষ্ণতত্ত্বে কৃষ্ণের যৌনতা পরিত্যক্ত হলো না; কিন্তু সেখানে দুটি কথা প্রাধান্য পেল, যথা: ক. বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রবিরোধী নয়; খ. কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তির ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। শাস্ত্রানুমোদিত বৈষ্ণব ধর্ম কর্মকাণ্ডের উপরে

৪. রামশরণ শর্মা, "মেটেরিয়াল মিলিউ অফ তান্ত্রিকজম" ('ইন্ডিয়ান সোসাইটি : হিস্টরিকাল প্রোবিংস : ইন মেমারি অফ ডি. ডি. কোসম্বী', আর এস শর্মা ও বিবেকানন্দ ঝা সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪)।

৫. বিষয়টির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বৈষ্ণবিজম ইন বেঙ্গল, ১৪৮৬-১৯০০', কলিকাতা, ১৯৮৫ (পরে সংক্ষিপ্ত 'ভি. আই. বি'), পৃ. ৫-১৩।

৬ কে. এম. পানিক্কর, 'এ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১০৪।

৭. সি. ভি. বৈদ্য, 'ডাউনফল অফ হিন্দু ইন্ডিয়া' (পুনঃ প্রকাশ, দিল্লী, ১৯৮৬), পৃ. ৪০০-৪০৩। আরো দ্রষ্টব্য : মুলকরাজ আনন্দের 'মিথুনশিল্প' সম্পর্কে সপ্রশংস মূল্যায়ন : মুলকরাজ আনন্দ, 'কামকলা', জেনিভা, ১৯৫৮, ভূমিকা।

প্রতিষ্ঠিত ; বৈষ্ণবাচার ও বৈষ্ণব পূজাপদ্ধতি বৈষ্ণব উপপুরাণসমূহে তালিকাভুক্ত এবং বর্ণিত হলো।[৮] কিন্তু যে-সব বৈষ্ণব আচার-বিচার পছন্দ করতেন না, অথচ যাঁদের কাছে নিছক যৌনতাও অশ্রদ্ধেয় ছিল, তাঁরাই একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। সেটি হলো ভক্তি। ভক্তিমূলক সুবিখ্যাত পুরাণ 'ভাগবতপুরাণ'। প্রচলিত ধারণা এই যে, এটি দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়। বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৬৯) 'ভাগবতপুরাণে'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৯] ত্রয়োদশ শতকে মিথিলার শিষ্ট-মন্ডলে এটি একটি 'উপপুরাণ' রূপে চিহ্নিত হয়।[১০] 'ভাগবতপুরাণে'র বিখ্যাত টীকাকার ছিলেন শ্রীধর স্বামী ; কোনো কোনো পন্ডিতের মতে তিনি বাঙালী ছিলেন।[১১] কিন্তু বাংলাদেশে, প্রযৌক্তিক অর্থে, ভক্তির তত্ত্ব তেমন জানা ছিল না। 'গীতা ভাগবত যে যে জনে পড়য়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাঁহার জিহ্বায় ॥' – লিখেছেন চৈতন্যের অমর জীবনীকার বৃন্দাবন দাস।[১২]

বিদ্যাপতি, মিথিলার বিখ্যাত কবি, ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক চমৎকার পদাবলী রচনা করেছিলেন।[১৩] সে-পদাবলী পরবর্তী পদকর্তাদের আদর্শ হয়ে রইল। কেউ কেউ বলেন, বিদ্যাপতি ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না ; ছিলেন 'পঞ্চোপাসক'। কিন্তু যে হৃদয়-বিদারক ভক্তি নিয়ে 'দয়া'র জন্য বিদ্যাপতি মাধবের কাছে 'বহুত মিনতি' করেছেন, তাতে তাঁর বৈষ্ণবীয় মনোভাবই প্রকটিত হয়েছে। মিথিলার হিন্দুধর্মের পরিমন্ডলে যেমন ভক্তির অন্তর্নিহিত বিদগ্ধতা সম্মাননীয় হয়ে ওঠে, বাংলাদেশে ঠিক তা হয় নি। এখানে তান্ত্রিক দেবী বাসুলি পূজার অনুষ্ঠানরূপে অশ্লীল গান করা হতো রাধাকৃষ্ণের নামে। তাই দেখা যায় ১৯১৬-তে আবিষ্কৃত বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'।[১৪] এ-পুঁথির রাধাকৃষ্ণ বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ নন। এখানে

৮. বৈষ্ণব উপপুরাণ প্রসঙ্গে : আর. সি. হাজরা, 'স্টাডিস অন দ্য বৈষ্ণব উপপুরাণস', কলিকাতা, ১৯৫৮, প্রথম খন্ড ; ভি আই. বি, পৃ. ১৩।

৯. দানসাগর, ১, পৃ. ৬ (দ্রষ্টব্য নং ৩)।

১০. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), 'বর্ণরত্নাকর অফ জ্যোতিরীশ্বর, ববুয়া মিশ্র', কলিকাতা, ১৯৪০, পৃ. ৬০।

১১. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, "শ্রীধর স্বামীর কুলপরিচয় ও কালনির্ণয়" ('প্রবাসী' ১৩৫৮, মাঘ), পৃ. ৪১১-৪১৪।

১২. মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'বৃন্দাবন দাস : শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত'। কলিকাতা, ১৩৫৬, ষষ্ঠ সং, পৃ. ১২ (অতঃপর, চৈ-ভা)।

১৩. নগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত), 'বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ', কলিকাতা, ১৯৫২।

১৪. বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), 'বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', কলিকাতা, ১৯১৬।

কৃষ্ণ রিরংসায় উন্মত্ত গ্রাম্য যুবক। রাধা লজ্জিতা, সন্ত্রস্তা, গ্রামের মেয়ে। বহু রকমের সুরের ও তালের উল্লেখ করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের পরিচয় নিয়ে বিতর্কের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এখানে তার আলোচনার স্থান নেই। নিদেনপক্ষে দু-জন বিশিষ্ট চন্ডীদাস তো ছিলেনই, যথা: পূর্বোক্ত বড়ু চণ্ডীদাস, এবং সহজিয়া পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস। দ্বিতীয় চণ্ডীদাস অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তাঁরই বিখ্যাত কথা: 'শুনহ মানুষ ভাই / সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ॥' এখানে 'মানুষ' কথাটির একটি সহজিয়া তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা আছে; তা ধরা না হলেও, এই ঘোষণায় মানবতার যে জয়ধ্বনি শোনা যায়, তার তুলনা নেই।

বৈষ্ণবতার সামাজিক/ভৌগোলিক অর্থে নিম্নস্তরে ভক্তি প্রথমে না থাকলেও, পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তার লক্ষণ দেখা যায়। সেই শতকের সপ্তম দশকে মালাধর বসু 'ভাগবতপুরাণ'-কে অবলম্বন করে রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'।[১৫] মালাধর ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী; বাড়ি ছিল বর্ধমানের কুলীনগ্রামে, এবং জাতিতে ছিলেন কায়স্থ। চৈতন্যের জন্মের কিছু পরে মালদহের রামকেলি গ্রামের চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য রচনা করেন 'হরিচরিতম্'[১৬]। এ-কাব্যেও ভক্তি স্পষ্ট। মনে হয়, ভক্তি তিন ধরনের লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে এসেছিল, যথা: ক. উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চজাতির লোক, যিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নূতন কোনো অর্থ খুঁজে পান নি; খ. উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতজ্ঞ, উচ্চ বর্ণের লোক, যিনি 'ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণকাহিনীর নূতন কাব্যিক আদর্শ খুঁজে পেলেন; এবং গ. অবস্থাপন্ন শিক্ষিত নাগরিক, যিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ এবং প্রচলিত লোকধর্ম পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি।

৪

বৈষ্ণব ভক্তি একটি সদর্থক এবং ধর্মীয়-সামাজিক অর্থে প্রগতির সহায়ক মতাদর্শ রূপে উপস্থাপিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। ভক্তির যুক্তি-রূপে সমকালীন

১৫. নগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত), 'মালাধর বসু: 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কলিকাতা, ১৯৪৪।
১৬. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য: 'হরিচরিতম্', কলিকাতা, ১৯৬৭।

চৈতন্য-জীবনীকারগণ প্রচলিত সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেন।[১৭] তাঁদের বিবরণে এবং পরবর্তীকালে সংগ্রহ করা বিভিন্ন তথ্যের আলোকে, কতকগুলো সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন গৌরপদ রচয়িতা লিখেছিলেন যে, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে ষড়্‌রিপুর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়; ভক্তি প্রচার করে চৈতন্য যে শুধু পাপীদের উদ্ধার করেন, তাই নয়; সাধারণ 'জীব'দেরও উদ্ধার করেছিলেন।[১৮] বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, ধনীদের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না; তাঁরা তাঁদের অর্থ বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতেন।[১৯] যাকে লোকধর্ম বলা হয়, তার ভিত্তি ছিল যাদুবিশ্বাস, এবং তার আচার-অনুষ্ঠান ছিল মদ্য মাংস ব্যবহারের ফলে নিন্দনীয়।[২০] নবদ্বীপের হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ছিল প্রশ্নাতীত, এবং তাঁরা সর্বদা নিজেদের বর্ণ-ভিত্তিক অধিকারের উপরেই জোর দিতেন। তার কারণ ছিল এই যে, এককালে রাজাদের ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের যেসব উপনিবেশ গড়ে ওঠে, মুসলমানদের রাজত্ব কায়েম হওয়ার ফলে সেগুলো লুপ্ত হয়ে যায়।[২১] সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরা পূর্বে অন্যান্য যে-সব সুযোগ-সুবিধা পেতেন (যেমন মন্ত্রীত্বের পদ

১৭. মণীন্দ্রনাথ গুহ (সম্পাদিত), 'কবি কর্ণপুর: 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্', পানিহাটি, ১৯৭১, মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'মুরারি গুপ্ত: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্', কলিকাতা, ১৯৪৫, চতুর্থ সং; বৃন্দাবন দাস, প্রাগুক্ত (চৈ-ভা); শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ: শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', অম্বিকা-কালনা, ১৯২৩ (কালনা সংস্করণ রূপে বিখ্যাত); মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত) 'লোচন দাস: চৈতন্যমঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৪৭, তৃতীয় সং; বিমানবিহারী মজুমদার, সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'জয়ানন্দ: চৈতন্যমঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭১; দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী (সম্পাদিত), গোবিন্দদাসের কড়চা', কলিকাতা, ১৯২৬; সুকুমার সেন (সম্পাদিত), 'চূড়ামণি দাস: গৌরাঙ্গ বিজয়', কলিকাতা, ১৯৫৭।

১৮. জগদ্বন্ধু ভদ্র ও মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'গৌরপদতরঙ্গিণী', কলিকাতা, ১৩৪১, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথন তরঙ্গ, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস, গৌরাবতার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য,' পৃ. ১৮-৩৬; ২৪১। 'বাসুদেব ঘোষ ভনে / কাঁদ শশী কি কারণে / জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী।।'

১৯. 'চৈ-ভা', পৃ. ৩৩। 'জগৎ প্রমত্ত ধনপুত্র বিদ্যারসে। দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে।। তারে বলে সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে। দশ বিশ জন যার আগে পিছে চলে।।'

২০. 'চৈ-ভা', পৃ. ১২। 'বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।'

২১. দ্রষ্টব্য: পুষ্পা নিয়োগী, 'ব্রাহ্মণিক সেটলমেন্টস ইন ডিফারেন্ট সাবডিভিশনস অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৬৭।

নাত) তাও রইল না। বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ হয়ে যদি সুলতানদের দরবারে মন্ত্রিত্ব লাভ হতো তবুও সেই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে মুসলমান-সংসর্গের অভিযোগ আনা অসম্ভাব্য ছিল না ; সনাতন গোস্বামী শুধু একারণেই প্রায় অচ্ছুৎ ছিলেন।[২২] এ-অবস্থায়, বর্ণভিত্তিক ধর্মীয় অধিকারসমূহের, এবং ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকারের তত্ত্ব সমকালীন স্মৃতিতে বিশিষ্ট স্থান পেল। চৈতন্যের সমকালীন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন এমন কথাও বললেন যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য কোনো জাতি নেই ; এবং, তাঁর মতে শূদ্রের প্রধান কৃত্যই হলো 'দ্বিজশুশ্রূষা'।[২৩] স্মার্তমতে স্ত্রীলোকদের এবং শূদ্রদের বেদমন্ত্র পাঠের অধিকার ছিল না।[২৪] এখানকার মতো তখনও শূদ্রদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত, সমৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, এবং ধনী। জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কায়স্থ, অথবা শূদ্র।[২৫] তাঁদেরই পৃষ্ঠ-পোষকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিবর্ধিত হয়েছে। তাঁরা এ-সব বিধান মানবেন কেন ?

প্রচলিত স্মৃতির বিধানসমূহে লোকধর্ম সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা উদারতা দেখা যায়। শাবরোৎসব, মনসাপূজা, বাসুলিপূজা, যক্ষপূজা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্রতপার্বণ ব্রাহ্মণরা মেনে নিয়েছিলেন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ধ্যানধারণার প্রভাব ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে স্পষ্ট। আঞ্চলিক/লৌকিক ধর্মানুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানসমূহ প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মের অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন, বলা যায়।[২৬] কিন্তু তাতে সামাজিক সংহতি জোরদার হয় নি। বর্ণভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিক সংহতি থাকে না ; থাকে শুধু একটা ধর্মের আবরণ। হিন্দুধর্ম ছিল সেই আবরণ মাত্র।

২২. সনাতন ছিলেন 'দবীর খাস', অথবা প্রাইভেট সেক্রেটারি। দ্রষ্টব্য : 'চৈ-ভা', মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৯৫। রূপ এবং সনাতন চৈতন্যকে বলেন : 'নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ...ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম। গোব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।'

২৩. বেণীমাধব দত্ত (সম্পাদিত), রঘুনন্দন : 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি', "শূদ্রাহ্নিকাচার তত্ত্বম্"। কলিকাতা, পৃ. ৫০৪।

২৪. শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্, পৃ. ৫০৪।

২৫. যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত), 'আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৩, ১৪৫।

২৬. কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ (সম্পাদিত), 'গোবিন্দানন্দ : বর্ষক্রিয়া কৌমুদী,' কলিকাতা, ১৯০২, রঘুনন্দন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, 'কৃত্যতত্ত্বম্', এবং 'ভি. আই. বি', পৃ. ৩২-৩৪।

রক্ষণশীল সমাজে চিন্তাধারা রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় নূতন চিন্তার উন্মেষ ছিল অভাবনীয়। সেখানে সমস্ত জোর এসে পড়ে স্মৃতি, ব্যাকরণ আর নব্যন্যায়ের উপরে। স্মৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিধানসমূহের উদ্দেশ্যমূলক সংকলন, এবং উদ্দেশ্য-সম্ভূত তার ব্যাখ্যা। ব্যাকরণ—সর্বাংশে সংস্কৃত; ফলত বঙ্গভাষা ব্রাহ্মণ্য সমাজে অবহেলিত। আর প্রসিদ্ধ নব্যন্যায়—যা মিথিলাতে উদ্ভাবিত হয়—'তর্ক-কর্কশ' পরিভাষায় আচ্ছন্ন। এই পরিভাষা আয়ত্ত করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। নব্যন্যায়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপকদের কোনো সামাজিক মত ছিল না। এ-সব তথ্য চৈতন্যের সমকালীন বঙ্গীয় হিন্দু-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতার এবং অচলতার প্রমাণ।

এমন মনে হতে পারে যে বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সেখানে হিন্দু সংস্কৃতির অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়। কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু মন্দির ভাঙা হয়; বহু অঞ্চলে হিন্দুদের মুসলমান করা হয়। গাজি ও মোল্লাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। কোনো কোনো সুযোগসন্ধানী অভিজাত হিন্দু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য মুসলমান হলেন।[২৭] এ-সবই তর্কাতীত। কিন্তু এ-সম্পর্কে আরও তথ্য আছে যা বিচার্য। প্রথমত, মুসলমানগণ কখনো বাঙালি সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করেন নি। একাধিক সুলতান বঙ্গভাষার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, শাসনের ক্ষেত্রে, সামরিক ব্যবস্থায়, হিন্দুদের বিশিষ্ট স্থান ছিল; এ কথা ভুলি কী করে যে, হিন্দু জমিদার গণেশ (ঐতিহ্য অনুসারে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ) সুলতানি আমলেই বাংলার 'রাজা' হয়েছিলেন? কোনো হিন্দু গণ-বিদ্রোহের মাধ্যমে তিনি রাজা হন নি। রাজা হয়েছিলেন দরবারি রাজনীতির সূত্র ধরে। তৃতীয়ত, এ-প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, যাদের মুসলমান করা হয়েছিল, তারা কি হিন্দু/বৌদ্ধ ছিল? 'হিন্দু'-শব্দটির যে পারিভাষিক ব্যঞ্জনা আছে তা প্রচলিত পাথরপূজা এবং আঞ্চলিক পূজা-পার্বণের সব কিছু সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল কি? একাধিক স্মৃতি-নিবন্ধে হিন্দু 'কৃত্য' এবং সংস্কার বর্ণিত হয়েছে। তার বাইরে যে-সব পূজা-পার্বণ ছিল, সেগুলো কি স্মৃতিসম্মত, কিংবা শাস্ত্র-সম্মত ছিল?[২৮] তাছাড়া ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা

২৭. দুয়ার্ট ব/রবোসা, 'দ্য বুক' (অনুবাদ : এম. এল. ডেমস), লন্ডন, ১৯১৮, দুই খণ্ড, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৭-৪৮।

২৮. দ্রষ্টব্য : বিনয়কুমার সরকার, 'বাংলায় দেশী-বিদেশী : নব্য সংস্কৃতির লেনদেন', কলিকাতা, ১৯৪২।

জানা যায় না।[২৯] সবচেয়ে বড়ো কথা, চৈতন্যের জীবনীসমূহে কোথাও কোথাও মুসলমানদের অত্যাচারের কথা থাকলেও, তার উপরে বিশেষ কোনো জোর দেওয়া হয় নি। জোর দেওয়া হয়েছে হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্মের অবক্ষয়ের উপরে।

৫

অনেকক্ষেত্রেই অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মীয় ঘটনার অথবা ধর্মসংস্কারের সংযোগ থাকে; যেমন, পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে প্রটেস্টান্ট ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের যোগ ছিল।[৩০] কিন্তু, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে চৈতন্যের আবির্ভাবকালে অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ধর্মীয় ঘটনার সংযোগের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র কিছুটা বোঝা যায়। বিশেষ বিশেষ শ্রেণী অথবা 'জাতি' চৈতন্যের ধর্মান্দোলনকে সমর্থন করে, হয়তো তার মধ্যে অর্থনৈতিক সংযোগের বিষয়টি গবেষিত হতে পারে। কিন্তু তাতেও কোনো স্থির উপপাদ্য থাকে না। একটি হিসাবে দেখা যায়, চৈতন্যের ৪৯০ জন পরিকরদের মধ্যে ২৩৯ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন ছিলেন বৈদ্য; ২৯ জন ছিলেন কায়স্থ; ২ জন মুসলমান, এবং ১৬ জন 'স্ত্রীলোক' ছিলেন।[৩১] পরবর্তীকালে অবশ্য 'শূদ্র' বৈষ্ণবদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ-বিষয়টা পরে আলোচ্য। প্রথম দিকে পরিকরদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সাংখ্যাধিক্য থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্তত নবদ্বীপের, শান্তিপুরের অনেক ব্রাহ্মণের চিন্তা-ভাবনা প্রচলনির্ভর ছিল না। সব ব্রাহ্মণই স্মৃতির এবং নব্য-ন্যায়ের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যান নি।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে উচ্চ শ্রেণীর বৈষ্ণবদের নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে-শান্তিপুরে এসেছিলেন। এই দুই নগরে শ্রীহট্ট থেকে আগত বৈষ্ণবরাই সক্রিয় ছিলেন। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বর্ধমানের

২৯. ঐ; ই. সি. ডিমক, "হিন্দুইজম এ্যান্ড ইসলাম ইন মিডিয়াভাল বেঙ্গল", র‍্যাচেল ভ্যান বৌমার (সম্পাদিত), 'এ্যাসপেক্টস অফ বেঙ্গলী হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি', নিউ দিল্লী. ১৯৭৬, পৃ. ১০। এখানে একটি পাদটীকায় বলা হয়েছে যে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষ, আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪১ লক্ষ।

৩০. বিষয়টির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: আর. এইচ. টনি, 'রিলিজিয়ন এ্যান্ড দ্য রাইজ অফ ক্যাপিটালিজম', পেঙ্গুইন, পুনঃপ্রকাশ, ১৯৪৮।

৩১. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা, ১৯৫৯। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৬৭; এখানে লক্ষণীয়, দাক্ষিণাত্যে শৈব-ভক্তি আন্দোলনেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য ছিল। দ্রষ্টব্য: কামিল জেবলেবিল, 'দ্য স্মাইল অফ মুরীগান', লাইডেন, ১৯৭৩, পৃ. ১৯২।

শ্রীখণ্ড গ্রামের, এবং কুলীনগ্রামের বৈষ্ণবদের সক্রিয়তার তথ্য পাওয়া যায়; শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য নরহরি সরকার সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে/ বিবিধ রাগিণীরাগে / ব্রজরস করিলেন গান ॥'[৩২]

নবদ্বীপের 'শ্রীহট্টিয়া' বৈষ্ণবদের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অথবা ধর্মাবলম্বনের পূর্ব-ইতিহাস অজ্ঞাত। এ-প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরী নামক সন্ন্যাসীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ছিলেন কুমারহট্ট (কামারহাটি) নিবাসী সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরীর গুরু। অদ্বৈত আচার্যেরও গুরু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী ; নিত্যানন্দ অবধূতকেও তিনি বৈষ্ণব করেন ; তার আগে, অনুমান করি, নিত্যানন্দ শৈব অবধূত ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর পরিচয় অজ্ঞাত। বিষ্ণুদাস আচার্য নামক এক ব্যক্তি অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন ; বলা হয় তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র।[৩৩] মাধবেন্দ্র পুরী, গুরুপরম্পরা অনুসারে, চৈতন্যের 'পরমগুরু' ছিলেন ; অথচ পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁর কোনো খোঁজ রাখলেন না।

বৈষ্ণবরা প্রথমে বহু বাধা পেয়েছিলেন ; ভক্তিমূলক বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা 'ভট্টাচার্য'দের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আদৌ সমর্থিত হয় নি। এ-কারণে, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, অদ্বৈত আচার্য ভীষণ রেগে যেতেন, এবং বিরোধীদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেন।[৩৪] সম্ভবত ব্রাহ্মণরা জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড থেকে ভক্তিমার্গকে ক্ষুদ্র ভাবতেন। বৈষ্ণব মাত্রই ছিলেন উপহাসের পাত্র।[৩৫] কেন এমন হলো, তা বুঝবার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা দরকার। ভক্তির উৎসরূপে 'ভাগবতপুরাণ' উল্লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থ ছাড়া অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল 'নারদ ভক্তিসূত্র'[৩৬] এবং 'শাণ্ডিল্যসূত্র'।[৩৭] চৈতন্যের

৩২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বৈষ্ণব পদাবলী,' কলিকাতা, ১৯৬১, ''রায়শেখর', পৃ. ৩০৩, পদ-১৪।

৩৩. হরিদাস দাস, 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', নবদ্বীপ, ১৯৮৭, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সং, পৃ. ১৩৭২, দ্রষ্টব্য : ফ্রেডহেলম হার্ডি, "মহাদেবেন্দ্রপুরী : এ লিঙ্ক বিটউইন বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম এ্যান্ড সাউথ ইণ্ডিয়ান ভক্তি" ('জার্নাল অফ দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি', ১৯৭৪, নং ২)।

৩৪. 'চৈ-ভা', পৃ. ১৩। 'শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে। দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ॥' ইত্যাদি।

৩৫. 'চৈ-ভা', পৃ. ৩৬। 'কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে। ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥ ...'দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে...আয্যা তর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া...'

৩৬. দ্রষ্টব্য : নন্দলাল সিনহা (সম্পাদিত), 'ভক্তিসূত্রস অফ নারদ এ্যান্ড শাণ্ডিল্যসূত্রম্,' দিল্লী, পুনঃপ্রকাশ, তারিখ নেই।

৩৭. ঐ।

সময়ে বিষ্ণু পুরী নামক অবাঙালী বৈষ্ণব 'ভাগবতপুরাণে'র ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক শ্লোকসমূহ 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-তে গ্রন্থিত করেন।[৩৮] তার পূর্বে রচিত হয় রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর 'ভগবদ্‌ভক্তিরসায়ন', এবং জীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ'। 'ভাগবত-পুরাণ'-সহ এ-সব ভক্তি-গ্রন্থে আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে সামাজিক ভাবধারার সংমিশ্রণ দেখা যায়। ভক্তিবাদীদের মৌল বক্তব্য ছিল এইরূপ :[৩৯]

ক. ভক্তি প্রধানত ভক্তের চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভক্তিমিশ্রিত চৈতন্য রহস্যবাদভিত্তিক। তাই তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ভক্তির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা সুকঠিন।

খ. ভক্তি সদাচারমূলক ; ভক্তির সাধনায় দুর্নীতির স্থান নেই।

গ. ভক্তি 'জ্ঞানবিচার' এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-ক্রিয়াকাণ্ড বিরোধী।

ঘ. ভক্তি বর্ণাশ্রমধর্মের ঊর্ধ্বে।

ঙ. ভক্তির সাধনায় জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপরে জোর দেওয়া হয়। সব ভক্তের মধ্যে সাম্য মানা হয়।

চ. ভক্তির তত্ত্বে, এবং সাধনায় গুরুর বিশেষ স্থান আছে।

ছ. ভক্তি ছিল প্রধানত সন্ন্যাসী এবং যতিদের ধর্ম। অন্তত ভক্তিতত্ত্ব তাই বলে।

জ. ভক্তির পাত্র/পাত্রী, দেব/দেবী ভক্তের 'ব্যক্তিগত' দেবতা।

রূপ গোস্বামী-সংকলিত 'পদ্যাবলী'তে ভক্তি সম্পর্কে বেশ কিছু সংস্কৃত-শ্লোক সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি শ্লোকের ভাবানুবাদ নিচে দেওয়া হলো ; তা থেকে বৈষ্ণব ভক্তদের মনোভাব কিছুটা বোঝা যাবে।

ক. ভালো কাজ আর মন্দ কাজের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি ক্রমশ গভীরতর হোক [তাহলে খারাপ কাজ করলেও আমার কিছু হবে না]। সর্পরাজ বিষও বমন করেন ; চাঁদ থেকে অমৃত পাওয়া

৩৮. এ. বি. (সম্পাদিত), 'বিষ্ণুপুরী : ভক্তিরত্নাবলী', এলাহাবাদ, ১৯১৮।

৩৯. দ্রষ্টব্য : জে. এন. ফারকুহার ও এইচ. ডি. গ্রীসওয়াল্ড, 'দ্য রিলিজিয়াস কোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২২, বুক ২, অধ্যায় ৫, পৃ. ১৬৫-১৭৯ ; টমাস জে. হপকিন্‌স্‌, "দ্য সোস্যাল টিচিংস অফ দ্য ভাগবত পুরাণম্‌", মিলটন সিঙ্গার (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণ, মিথস, রাইটস এ্যান্ড এটিচিউডস', হনলুলু, ১৯৬৬, পৃ. ৩-২২ ; 'ভি. আই. বি.' পৃ. ৭১-৯০ ; উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য : কারিন শোমার ও এইচ. এইচ ম্যাকালয়ড (সম্পাদিত), 'দ্য সেন্টস : স্টাডিস ইন এ ডিভোশনাল ট্রেডিশন অফ ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৮৭।

যায়। শিব বিষও বহন করেন, অমৃতও বহন করেন। কারণ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। [বিষ্ণু পুরী রচিত][৪০]

খ. নানান রকমের ঔষধ খেলাম ; নানান নিয়ম মানলাম ; মৌনী হলাম ; বনে বাস করলাম ; শাস্ত্র কথা শুনলাম ; তীর্থে গেলাম ; তবু আমার বাসনার বিনাশ নেই। কিন্তু সামান্যভাবেও যখন গোবিন্দের পদকমলে মনঃসংযোগ করি, তখনি আমার বাসনা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে।

[অজ্ঞাত কবি রচিত][৪১]

গ. জ্ঞান ও কর্ম মাপা হয় ; কিন্তু ভক্তি, আর কৃষ্ণ নামের শক্তি মাপা যায় না। [শ্রীধর স্বামী][৪২]

ঘ. নীতিবাগীশদের মতে আমি মোহগ্রস্ত ; বেদবাদীদের মতে আমি ভ্রান্ত ; বন্ধুরা বলেন, আমি বাজে লোক ; আমার ভাইরা আমাকে নির্বুদ্ধি ভেবে ভালবাসে না। ধনীদের ধারণা, আমি পাগল। বিবেকী লোকদের মতে আমি দাম্ভিক। (তবুও) আমার ভক্তি এতই দৃঢ় যে, মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণপদকমলের চিন্তা ত্যাগ করতে পারি না। [মাধব রচিত][৪৩]

ঙ. কণাদের দর্শন পড়েছি ; ন্যায়শাস্ত্র আমার জানা আছে। মীমাংসাও জানি ; জানি সাংখ্য। যোগশাস্ত্রের সঙ্গেও আমি পরিচিত। যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে বেদান্তের চর্চা করেছি। এ সবের কোনোটাই আমার চিত্তকে তেমন আকর্ষণ করে না, যেমন করে কোনো এক নন্দের ছেলের বাঁশরী বাদনের মাধুরী-ধারা। [বাসুদেব সার্বভৌম][৪৪]

এ রকমের আরও অনেক শ্লোক 'পদ্যাবলী'তে আছে। বাসুদেব সার্বভৌম যে চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে তাঁর সাক্ষাৎকারের পূর্বেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, তা জানা গেছে।[৪৫] তিনি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর শ্লোকে অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশিত। এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত

৪০. রূপ গোস্বামী, 'পদাবলী', বহরমপুর সং, দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২-১৬, ২১-২২, ৮৬, ৯৮-৯৯ ইত্যাদি।
৪১. তদেব, পৃ. ১৫-১৬।
৪২. তদেব, পৃ. ২১-২২।
৪৩. তদেব, পৃ. ৮৬।
৪৪. তদেব, পৃ. ৯৮-৯৯।
৪৫. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা,' কলিকাতা, ১৯৫১, প্রথম খণ্ড, হেত্বাভাস প্রকরণ, পৃ. ৩৮।

থেকেই বোঝা যায়, বুদ্ধিজীবী-ভক্তগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে চেপে রাখেন।

৬

চৈতন্য [সংসারাশ্রমে গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত] (১৪৮৬-১৫৩৩) বৈষ্ণব ভক্তিকে জনচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাষ্ট্রের, অর্থনীতির, এবং সমাজব্যবস্থার মধ্যযুগীয় অবস্থায় আমাদের দেশে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদারনীতির উদ্ভাবনার ক্ষেত্র ছিল না। তাই ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে, ভক্তির সূত্র ধরে, এক ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক উদারনীতি চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রচলিত বৈষ্ণবতার কতকগুলো বিশিষ্ট ধারার কথা বলা হয়েছে। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ এসব ধারার সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা ভক্তির সঙ্গে 'ভাগবতপুরাণে' বর্ণিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীর মিশ্রণ ঘটালেন। তার কারণ ছিল এই যে, কৃষ্ণকাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

ভক্তির প্রচারের জন্য চৈতন্য যে-সব কাজ করেন, নিচে তা সাজিয়ে দেওয়া হলো।

ক. চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে একটি প্রভাবশালী বৈষ্ণব-গোষ্ঠী সংগঠিত হলো।

খ. 'মহান্ত'দের সংগঠন সম্ভবত চৈতন্যের নেতৃত্বে করা হয়।

গ. তিনি ঘরে ঘরে 'নাম' প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

ঘ. আগে বদ্ধদ্বার গৃহে, অথবা শ্রীরাম পণ্ডিত নামক বৈষ্ণবের অঙ্গনে, কীর্তন হতো। চৈতন্য শোভাযাত্রা সহ 'নগর কীর্তন' পরিচালনা করেছিলেন। এ-কীর্তনে জাত-বিচার করা হতো না।

ঙ. চৈতন্য নিজে স্বর্ণকার, মালাকার, শঙ্খকার, গোয়ালা প্রভৃতি শূদ্র, এবং পেশাভিত্তিক জাতিসমূহের লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।

চ. নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই এবং মাধাই নামে দুই কুক্রিয়াসক্ত দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে তিনি 'উদ্ধার' করেন।

ছ. চৈতন্য বৈষ্ণব কাহিনীর উপরে রচিত নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেন।

এখানে লক্ষণীয়, দক্ষিণ ভারতে শৈব নয়নার, এবং বৈষ্ণব আলবার ভক্তদের

সম্পর্কে বহু 'অতিপ্রাকৃত' গল্প তৈরি করা হয়।[৪৬] চৈতন্যের প্রামাণিক জীবনীসমূহে কিন্তু অতিপ্রাকৃত কাহিনী বিশেষ নেই। ভক্তি বৈষ্ণবদের দ্বারা একটি নান্দনিক 'রস' রূপে বিবেচিত হতে থাকে। রসসৃষ্টিতে ভাবের অস্তিত্ব অপরিহার্য। পাঁচটি ভাবের কথা বলা হলো, যথা : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বিশেষভাবে বৃন্দাবন দাসের বিবরণ পড়ে মনে হয়, নবদ্বীপে ভক্তি-প্রচারের সময়ে চৈতন্য 'দাস্যভাবে'র উপরে জোর দিয়েছিলেন।[৪৭] দাক্ষিণাত্যে শক্তি-আন্দোলনে 'দাস্য' প্রধান ভাব ছিল।[৪৮] ইন্দোনেশিয়াতে 'বক্তি' শব্দে দাস বোঝায়; 'বক্তি' শব্দটি 'ভক্তি' শব্দের ইন্দোনেশীয় রূপান্তর।[৪৯] চৈতন্যের সমকালীন শঙ্করদেব অসমে যে বৈষ্ণব-ভক্তি প্রচার

৪৬. দ্রষ্টব্য : কামিন জেবুলেবিল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ ; এম. জি. এস নারায়ণন ও ভেলুথাট কেশবম, "ভক্তি মুভমেন্ট ইন সাউথ ইন্ডিয়া", ডি এন ঝা (সম্পাদিত), 'ফিউডাল সোস্যাল ফরমেশন ইন আর্লি ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৮৭, পৃ. ৩৪৮-৩৭৫ ; সুবীরা জয়সবাল, 'অরিজিন এ্যান্ড ডেফেলপমেন্ট অফ বৈষ্ণবিজম', দিল্লী, ১৯৬৭ ; জান গোন্ডা, 'বিষ্ণুইজম এ্যান্ড শৈবিজম : এ কম্পারিজন', লন্ডন, ১৯৭০ ; হারমান কুলকে, "রয়াল টেম্বল পলিসি এ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ মিডিয়াভাল হিন্দু কিংডমস" এ এসম্যান ইত্যাদি (সম্পাদিত), 'দ্য কাল্ট অফ জগন্নাথ এ্যান্ড দ্য রিজিওনাল ট্র্যাডিশন অফ ওড়িশা', দিল্লী, ১৯৭৮ ; কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, 'ডেভলপমেন্ট অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৭৫ ; কে. সি. বরদাচারী, "সাম কন্ট্রিবিউশনস অফ দ্য আলবারস টু দ্য ফিলজফি অফ ভক্তি", 'আনালস অফ দ্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট', সিলভার জুবিলী ভল্যুম, ১৯৪২ ; ভেলুঘাট কেশবন, "দ্য টেম্বল বেস অফ দ্য ভক্তি মুভমেন্ট অফ সাউথ ইন্ডিয়া" ('প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস', ওয়ালটেয়ার, ১৯৭৯)।

৪৭. 'চৈ ভা', পৃ. ১৫৪ : 'নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব সর্বথা। তিলার্ধেক দাস্যভাব নাহিক অন্যথা।।'...পৃ. ১৭৫ : 'বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড় ধন। দাস্য লাগি রমা অজভাবের যতন। ...দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর...', পৃ. ১৯৮ : 'চৈতন্যের দস্য বই নিতাই না জানে। চৈতন্যের দাস্যে নিত্যানন্দ করে দান।।' পৃ. ২২৩ : 'নিমাঞি পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস...' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য 'চৈ চ' : পৃ. ৯৭ : 'দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ...নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল।। কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু।।' পৃ. ১৩১ : 'পিতামহ তরু সখাভাব কেনে নয়? / কৃষ্ণ-প্রেমার স্বভাব দাস্যভাব সে করায়।।'

৪৮. এম. জি. এস নারায়ণন ও কেশবন, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৪৯. দ্রষ্টব্য : সুবীরা জয়সবাল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭-৩৯, ১১০-১১১ ; বেণুগোপাল পানিক্কর, "ভাষা ইন্দোনেশিয়া" ('সরণী', কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃ. ৩২)।

করেন, তাতে দাস্যভাব প্রাধান্য পেয়েছে।[৫০] 'দাস্য' কোনো কোনো বৈষ্ণবীয় পুরাণেও বিশিষ্ট। 'দাস', অর্থাৎ কৃষ্ণদাস। 'দাস্যভাব' সম্পর্কে আপত্তি তুলে বলা হয়েছে যে, আসলে তার অর্থ ছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কর্তাব্যক্তিদের 'দাস'-দের মানসে তাদের দাসত্ব বদ্ধমূল করা, তাকে ভক্তিরসে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানীয় করে তোলা।[৫১] কিন্তু লক্ষণীয়, 'দাস্যভাব' কিছুটা গণতান্ত্রিক ছিল; অর্থাৎ 'জীব' মাত্রই যদি কৃষ্ণদাস হয়, তবে, অন্তত আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এক কৃষ্ণদাসের যে-রূপ অবস্থা এবং যে-অধিকার, অন্য কৃষ্ণদাসেরর তাই।[৫২] সেখানে সামাজিক বৈষম্য প্রতিফলিত হয় না।

চৈতন্য-প্রবর্তিত নামকীর্তনে কোনো বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল না। ভক্তিসহ 'নামগান' করলেই যদি ভক্তের উদ্ধার সম্ভাব্য হয়, তবে আর স্মার্ত ক্রিয়াকলাপের কোনো প্রয়োজন থাকে না, ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট অর্থে বৈষ্ণব ধর্ম, এবং সাধারণ অর্থে হিন্দু ধর্ম একটি ব্যাপক সামাজিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়। ভক্তির সামাজিকীকরণ অথবা সোশ্যালিজেশন করার জন্যই চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ প্রচলিত 'ভট্টাচার্য'-সংস্কৃতির এবং জীবনধারার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। বলা হলো, লেখাপড়া করলে মুক্তি হয় না, 'কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাই'; 'জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই'।[৫৩] এভাবে ভক্তিকে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকল্প রূপে উপস্থাপিত করা হলো। চৈতন্যের আন্দোলনে যেহেতু সংস্কৃত বিদ্যা-চর্চাকে ছোটো করে দেখা হলো, তাই স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে তাতে বাংলা ভাষার স্থান সুনিশ্চিত করা হলো। বাংলা ভাষায় রচিত হলো ধর্মীয় সঙ্গীত, চৈতন্য-জীবনী, সন্ত-জীবনী। বাংলা ভাষা ভক্তি-প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠল।

স্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চবর্গের হিন্দুগণ বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করেন। দুর্নাম রটিয়ে তাঁদের চরিত্রহননের জন্য চেষ্টা করা হয়।[৫৪]

৫০. দ্রষ্টব্য: এইচ. ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি, বৈষ্ণবিজম অফ শংকরদেব এ্যান্ড রামানুজ', দিল্লী, ১৯৭৩, পরিশিষ্ট ২।

৫১. নারায়ণন ও কেশবন, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫৫, ৩৬০; কামিল জেবলেবিলের ভিন্ন মত।

৫২. এই মত জেবলেবিলের। তিনি এ প্রসঙ্গে "স্পিরিচুয়াল ডেমোক্রেসী' শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন।

৫৩. 'চৈ-ভা', পৃ. ১৯১ : 'জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণরে॥' এবং মূল উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৯৭।

৫৪. 'চৈ-ভা,' পৃ. ১৯২ : 'শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরমে বলগিয়া। নিশায় এগুলো যায় মদিরা আনিয়া।' —ইত্যাদি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে কয়েকজন 'পাষণ্ড' নবদ্বীপের কাজিকে কীর্তন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে।[৫৫] কাজি নিজেও কীর্তনের ফলে 'হিন্দুয়ানী' বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিন্তিত হন। তিনি কীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করেন। চৈতন্য সাহসের সঙ্গে এই আদেশের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন এবং বিশাল নগরকীর্তন ও শোভাযাত্রা সংগঠিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তখন বিখ্যাত সুলতান আলা-উদ্-দীন হোশেন শাহ্ দেশের শাসনকর্তা, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে তখন অত্যাচার অভাবনীয় ছিল। কাজি ভয় পেয়ে কীর্তন নিষিদ্ধকরণের আদেশ তুলে নিলেন, এবং সুদর্শন, তরুণ চৈতন্যকে 'গ্রাম সম্পর্কে' নিজের ভাগ্নে বলে অভ্যর্থনা জানালেন।[৫৬] এ-ঘটনার ফলে ভক্তি, কীর্তন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কিন্তু সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা কমে নি। পরবর্তী বৈষ্ণবরা 'অধ্যাপক'-চৈতন্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে কাহিনী তৈরি করেছিলেন।[৫৭] শেষপর্যন্ত নবদ্বীপের ছাত্ররাই তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়, এমনকি তাঁকে জব্দ করার জন্য 'সমবায়' পর্যন্ত গঠন করে।[৫৮] এতে পণ্ডিত, এবং অধ্যাপক-রূপে চৈতন্যের শোচনীয় ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। বড়োই দুঃখের কথা হলো এই যে, বাঙালি ছাত্রদের দুর্নাম অনেক আগে থেকেই ছিল ; কাশ্মীরের খ্যাতনামা কবি ক্ষেমেন্দ্র, কাশ্মীরে পঠন-পাঠনে রত গৌড় দেশীয় ছাত্রদের গুণ্ডামোর, দৌশ্চারিত্র্যের, মাতলামোর যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পাঠ করলে স্তম্ভিত হতে হয়।[৫৯] চৈতন্য নিজেও যখন ছাত্র ছিলেন তখন তাঁর ব্যবহারও সমালোচিত হয়েছিল। যাই হোক, আমার ধারণা—এই 'পড়ুয়া'রা তাঁকে ঘরছাড়া করল ; কারণ, বৃন্দাবন দাসের বিবরণ অনুসারে, উক্ত 'সমবায়' গঠনের পরেই, দুঃখিত, আর ব্যর্থতার চিন্তায় বিরক্ত, চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রী-কে কাঁদিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হলেন ; কিন্তু মাতার কথা ভেবে নিরুদ্দেশ হন নি। পুরীতে যাওয়ার এবং সেখানে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের করুণ কাহিনী

৫৫. 'চৈ-চ', পৃ. ৭৬ : 'হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল / আসি কহে হিন্দুর ধর্ম নাশিল নিমাই / যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই ॥' ইত্যাদি।

৫৬. 'চৈ-চ', পৃ. ১৭৪ ; চৈ-ভা', ২৬৬-২৭৭।

৫৭. 'চৈ-চ', পৃ. ১৬০-১৬৫। দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে চৈতন্যের বিচার।

৫৮. 'চৈ-ভা', পৃ. ২৯১-২৯২। চৈতন্যের বিখ্যাত উক্তি : 'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে।' 'চৈ-ভা', পৃ. ২৯২।

৫৯. ই. ভি. ভি. রাঘবাচার্য ও ডি. জি পাঠ্য (সম্পাদিত), 'ক্ষেমেন্দ্র : লঘু কাব্যসংগ্রহ', হায়দ্রাবাদ, ১৯৬১, "দেশোপদেশ : ষষ্ঠ উপদেশ : ছাত্রবর্ণনম্", পৃ. ২৭০-২৮৪।

লোক-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে ; তার অর্থ, এ-ঘটনায় 'পাষণ্ড'-দের চোখের জল না পড়লেও অগণিত সাধারণ নরনারী সুগভীর বেদনা অনুভব করেন ; তারই সুস্পষ্ট আভাস আছে চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পারিকর বাসুদেব ঘোষ রচিত পদাবলীতে।[৬০]

৭

চৈতন্যের সঙ্গে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত এবং গদাধর পণ্ডিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চারটি 'শাখা'র কথা বলেছেন ; যথা : চৈতন্যের শাখা, অদ্বৈত আচার্যের শাখা, নিত্যানন্দের এবং গদাধর পণ্ডিতের দুই শাখা।[৬১] এঁরাই ছিলেন প্রধান বৈষ্ণব। পুরীতে চৈতন্য অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দকে ধর্ম-প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৬২] সম্ভবত বার্ধক্যের জন্য অদ্বৈত আচার্য বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তাঁর শাখার বৈষ্ণবদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী, এবং পুত্র অচ্যুতানন্দ (বৈষ্ণব শাখার বৈষ্ণব) অদ্বৈতপন্থী বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধ করেন।[৬৩] শান্তিপুরে তাঁর বংশ 'গোসাই'-বংশ রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। বর্ধমানে, পাবনাতে, ঢাকায়, অদ্বৈতের জন্মভূমি শ্রীহট্টে, এবং মালদহের গিয়াশপুরে অদ্বৈত শাখার বৈষ্ণবদের কিছুটা প্রভাব ছিল। তাঁদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন বর্ধমানে নবগ্রামে শ্যামদাস আচার্য, ঢাকা জেলার তেওতা গ্রামে ঈশান নাগর, এবং শ্রীহট্টে রাজা দিব্য সিংহ। প্রক্ষিপ্তভাবে অদ্বৈত আচার্যের ও সীতা দেবীর কয়েকটি জীবনী রচিত হয়েছিল।[৬৪]

উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন নিত্যানন্দ অবধূত।[৬৫] তাঁর বারোজন প্রধান পরিকর 'গোপাল' আখ্যায় ভূষিত হয়ে মধ্য-রাঢ় অঞ্চলে দাস্যভাব প্রচার

৬০. মালবিকা চাকী (সম্পাদিত) : 'বাসু ঘোষের পদাবলী', কলিকাতা, ১৯৬১ ; দ্রষ্টব্য : 'গৌরপদতরঙ্গিণী', পূর্বোক্ত, ৩য়, ৪র্থ উচ্ছ্বাস, পৃ. ২৩৬-২৬২।

৬১. চার শাখার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : চৈ-চ', আদিলীলা, পৃ. ১২৩-১২৪।

৬২ 'চৈ-চ', পৃ. ৩৮৭ : 'আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান…' ইত্যাদি।

৬৩. 'ভি আই বি', অধ্যায় ছয়, পৃ. ১২২-১৩২।

৬৪. মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'অদ্বৈত প্রকাশ, ঈশান নাগর', কলিকাতা, ১৯৩২-৩৩ ; রবীন্দ্রনাথ মাইতি (সম্পাদিত), 'অদ্বৈতমঙ্গল', হরিচরণ দাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, সীতাদেবীর জীবনী 'সীতাগুণকদম্ব'।

৬৫. 'ভি. আই বি', অধ্যায় সাত, পৃ. ১৩৩-১৫৮ ; অমূল্যধন রায়ভট্ট, 'দ্বাদশ গোপাল', পানিহাটি, ১৯২৪।

করেন। বৈষ্ণব ঐতিহ্যে তাঁরা 'দ্বাদশ গোপাল' নামে পরিচিত।[৬৬] তাঁরা হলেন, অভিরাম [হুগলী : খানাকুল-কৃষ্ণনগর], ধনঞ্জয় পণ্ডিত [বর্ধমান : শীতলগ্রাম], সুন্দরানন্দ ঠাকুর [যশোহর : মহেশপুর], গৌরীদাস পণ্ডিত [বর্ধমান : অম্বিকা-কালনা], কমলাকর পিপলাই [হুগলী : মাহেশ], উদ্ধারণ দত্ত [হুগলী : সপ্তগ্রাম], মহেশ পণ্ডিত [নদীয়া : পালপাড়া], পুরুষোত্তম দাস [নদীয়া : চাঁদুরে], পরমেশ্বর দাস [হুগলী : তরা-আটপুর], কালাকৃষ্ণ দাস [বর্ধমান : আকাইহাট], শ্রীধর [নদীয়া : নবদ্বীপ], এবং হলায়ুধ ঠাকুর [নদীয়া : রামচন্দ্রপুর]।

নিত্যানন্দ সম্পর্কে বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস লিখেছিলেন : 'মত্ত সিংহ যেন/ গরজন ঘনঘন / জগমাঝে কাহু না মানে।'[৬৭] অসাধারণ লোক ছিলেন তিনি ; বিচিত্র সাজে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছেন। সপ্তগ্রামের বণিকদের তিনি 'উদ্ধার' করেন। জাতবিচার মানতেন না নিত্যানন্দ, সর্বদা 'শূদ্রের আশ্রমে' থাকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে চৈতন্যের কাছে অভিযোগ করা হয়। চৈতন্য তা অগ্রাহ্য করলেন।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে, বৃন্দাবনে, চৈতন্যের মতাবলম্বী বলে পরিচিত ষড়্‌গোস্বামী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।[৬৮] এঁরা হলেন দুই ভাই, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী ; তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী ; একদা নিত্যানন্দের অনুচর, সপ্তগ্রামের ধনী গৃহের সন্তান, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ; কাশীর রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ; এবং দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব গোপাল ভট্ট গোস্বামী। বাংলাদেশে যাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন গৃহস্থ কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং পরম পণ্ডিত। সনাতন ও রূপ ছিলেন, আধুনিক ভাষায় 'ক্যাবিনেট' পর্যায়ের মন্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং কবি। রঘুনাথ প্রসিদ্ধ ধনীর সন্তান ছিলেন ; তাঁর অর্থে নিত্যানন্দ 'চিড়ামহোৎসব' করেছিলেন।[৬৯] রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠক ; গোপাল ভট্ট পণ্ডিত ছিলেন। আর জীব গোস্বামীরও ছিল প্রায় অতুলনীয় পাণ্ডিত্য।

৬৬. 'দ্বাদশ গোপাল', দ্রষ্টব্য : 'ভি. আই. বি', অধ্যায় আট, পৃ. ১৫৯-৭৩।
৬৭. 'বৈষ্ণব পদাবলী', পূর্বোক্ত, পদ আঠারো, পৃ. ৩৭৩।
৬৮. দ্রষ্টব্য : নরেশচন্দ্র জানা, 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী', কলিকাতা, ১৯৭০।
৬৯. চিড়ামহোৎসবের বিবরণ, 'চৈ-চ', ৭৩২-৩৪ : 'বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচসাতে। এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে ॥ এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া। অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥ অর্দ্ধেক খনাবর্ত্ত দুগ্ধতে ছানিল। চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥'

একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বের অভাবে চৈতন্যের ধর্মান্দোলন ক্রমশ মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছিল ; এক-এক জায়গায় এক-এক রকমের তত্ত্বের অথবা মতবাদের উদ্ভব হচ্ছিল। এমনকি চৈতন্যের নামে কোনো কোনো লোক এমন সব মত প্রচার করছিল, যা ছিল নিতান্ত অভব্য এবং অশ্রদ্ধেয়। রাঢ়ে-বঙ্গে বিভিন্ন দল ও উপদল গঠিত হয় ; তাদের মধ্যে প্রধান ছিল :

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য সম্প্রদায়।
নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়।
শ্রীখণ্ডের 'গৌরনাগরবাদী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়।[৭০]
গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী 'গদাই গৌরাঙ্গ' সম্প্রদায়।[৭১]
চৈতন্য-পূজক 'গৌরপারম্যবাদী' সম্প্রদায়।[৭২]
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভক্ত-সম্প্রদায়।[৭৩]
প্রচলিত বৈষ্ণব মত-বিরোধী বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

যতদূর জানা যায়, এসব বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এ-অবস্থায় প্রয়োজনীয় ছিল একটি কেন্দ্রীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সেই কেন্দ্রীয় তত্ত্ব নানাভাবে লিখলেন। ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, বৈষ্ণবীয় পুরাণের ব্যাখ্যা, বিবিধ কাব্য-নাটক-চম্পূ, বৈষ্ণব স্মৃতি, সন্ততত্ত্ব, এমনকি বৈষ্ণবীয় ব্যাকরণ—এ সবই তাঁরা নতুন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করে রচনা করলেন। তাঁদের রচনাসমূহ সামূহিকভাবে 'গোস্বামী-শাস্ত্র' হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের বিবিধ গ্রন্থসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিদগ্ধতা, বিচারের সূক্ষ্মতা, এবং চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভাষায় অসামান্য অধিকার দেখা যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালী কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিণত বার্ধক্যে রচনা করেন তাঁর অমর চৈতন্য-জীবনী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন ; সম্ভবত বঙ্গভাষায় চৈতন্য-জীবনী রচনা করার জন্য তিনি 'গোস্বামী' রূপে পরিচিত হলেন না। কিন্তু বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আলোকে

৭০. গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব', শ্রীখণ্ড, বর্ধমান, ১৯৫৪, দ্বিতীয় সং ; 'ভি. আই বি.', অধ্যায় নয়, পৃ. ১৯০-২০০।

৭১. 'ভি. আই, বি.', পৃ. ১৯০-১৯১।

৭২. মণীন্দ্রনাথ গুহ (সম্পাদিত), প্রবোধানন্দ সরস্বতী: 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্', পানিহাটি, ১৯৭০।

৭৩. হরিদাস গোস্বামী, 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনাম স্তোত্র', কলিকাতা ১৯২২। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবাচার্যকে দীক্ষা দেন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১৩৭৩।

তিনি যে-ভাবে চৈতন্যের জীবনী রচনা করেছেন, তার সৌন্দর্য, মাধুর্য, পূর্ণতা ছিল অতুলনীয়। এ-ধরনের রচনা বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই।

বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ চৈতন্যের মত অনুসারে এ-সব লিখেছিলেন কি-না, অথবা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় চৈতন্যের মত কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল, এ-সব প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু তার আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে, বৃন্দাবনের গৌড়ীয় মতে চৈতন্যের প্রসঙ্গ সামান্যই আছে; সেখানে সর্বত্র কৃষ্ণেরই প্রাধান্য। এ কৃষ্ণও আবার 'গোপীকান্ত', 'মুরারি' নন। এখানে 'মধুরভাবে'র প্রাধান্য; অন্যান্য 'ভাব' প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'[৭৪] এখানে 'মধুরভাব' 'রাগানুগা' ভক্তি মিশ্রিত হয়ে সৃষ্ট হলো কৃষ্ণের 'পরকীয়া' রতির তত্ত্ব; সব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা বাংলাদেশে 'পরকীয়া রতি'-র তত্ত্ব মেনে নিলেন।[৭৫] অগণিত গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার দার্শনিক মতের নাম দেওয়া হলো 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'। অর্থাৎ 'জীবে'র সঙ্গে কৃষ্ণ-রূপ 'ব্রহ্মনে'র যেমন অভেদত্ব, তেমনই ভিন্নতা। একই সঙ্গে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক এই সম্পর্ক যেহেতু যুক্তিবিরুদ্ধ, তাই তা 'অচিন্ত্য'।[৭৬] যে স্মার্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধেই ছিল চৈতন্যের, নিত্যানন্দের আন্দোলন, তাই বৈষ্ণবীয় রূপ পেল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' নামক বিশাল বৈষ্ণব স্মৃতির গ্রন্থে।[৭৭] যে পাণ্ডিত্যের এবং 'শুষ্ক' জ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে চৈতন্য প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নির্বাসিত হলেন, তারই অসামান্য প্রকাশ দেখি 'গোস্বামী-শাস্ত্রে'। এই 'জ্ঞান-বিচারে'র ধারাকে উচ্চবর্গের কাছে গ্রাহ্য করার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, চৈতন্য নিজেও ছিলেন প্রকাণ্ড নব্যনৈয়ায়িক! তিনি নাকি ন্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র 'পরীক্ষা' নামক একটি টীকা রচনা করেছিলেন![৭৮] শুধু তাই নয়; যে-চৈতন্য, একজন বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কাছ থেকে চাউল আনার জন্য স্ত্রীসংসর্গের অপরাধে ছোটো হরিদাসকে তাড়িয়ে

৭৪. 'চৈ-চ', পৃ. ২৭২-২৮৩।
৭৫. 'ভি. আই. বি.', পৃ. ১০৮-১১১।
৭৬. স্টুয়ার্ট মার্ক এলকম্যান, 'জীব গোস্বামী'স তত্ত্বসন্দর্ভ', দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৩; 'চৈ-চ', পৃ. ৫১, ৫৬।
৭৭. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (সম্পাদিত), 'গোপাল ভট্ট: হরিভক্তি বিলাস', বহরমপুর, ১৮৯৪, দ্বিতীয় সং।
৭৮. দ্রষ্টব্য: 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ (পত্রিকা)', অক্টোবর ১৯৮২-মার্চ ১৯৮৩, পৃ. ১৮২।

দিলেন[৭৯] (ছোটো হরিদাস পরে এলাহাবাদে গিয়ে আত্মহত্যা করেন), সেই চৈতন্যের মুখ দিয়ে, রাগানুগা পরকীয়া রীতির সমর্থনে, অশ্লীল সংস্কৃত শ্লোক পর্যন্ত বলিয়ে নেওয়া হয়েছে।[৮০]

এ-প্রসঙ্গ আর বড়ো করব না। বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকেই জানতেন যে বৃন্দাবনে গোস্বামীগণ একটি ব্যাপক ধর্মতত্ত্ব রচনা করেছেন। যখন দেখা গেল, বাংলাদেশে বৈষ্ণবদের মধ্যে নানান ধরনের মতবাদ আছে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীও আছে, তখন তাত্ত্বিক একতার জন্য অনেকেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনজন সক্রিয় বৈষ্ণব সেই তত্ত্বগ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করার জন্য বৃন্দাবনে গেলেন। তাঁরা হলেন বর্ধমানের যাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, রাজশাহীর খেতুরির নরোত্তম দত্ত এবং মেদিনীপুরের ধারেন্দা-গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দ।[৮১] তাঁরা বৃন্দাবন থেকে বহু পুঁথি নিয়ে এলেন। বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচার করার জন্য অনেকগুলো বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বড়ো মহোৎসব হলো খেতুরিতে, সম্ভবত ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে, অথবা তার কাছাকাছি সময়ে। অন্তত পচাঁনব্বই জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু ও মহান্ত সশিষ্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতবাদ গ্রহণ করা হলো।[৮২]

৮

খেতুরির বৈষ্ণব সম্মেলন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপে চৈতন্য যে-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সমাপ্তি এই সম্মেলনে সূচিত হয়। কারণ যখন ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কেন্দ্রীকরণ হয়, তখন ধর্মীয় আন্দোলন আর 'আন্দোলন' থাকে না; তা ধর্ম হয়ে পড়ে। ইউরোপের 'রিফর্মেশন' অথবা ক্যাথলিক ধর্ম-বিরুদ্ধ সংস্কার আন্দোলনেও এই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এখন চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনের সদর্থক ফলসমূহ আলোচ্য।

৭৯. 'চৈ-চ', পৃ. ৬৯০-৬৯৩। চৈতন্য বলেছিলেন: '...বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥'

৮০. 'চৈ-চ', পৃ. ১৮৭-১৮৮। শ্লোকের প্রথম চরণ; 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা'।

৮১. দ্রষ্টব্য: 'ভি. আই. বি.', অধ্যায় বারো, চোদ্দো, পনেরো, পৃ. ২০১-২৫৬।

৮২. ঐ, পৃ. ২০১-২৩৮।

চৈতন্যের এবং তাঁর পরিকরদের অসাধারণ উৎসাহ, উদ্দীপনা, এবং উচ্ছ্বাসের কোনো প্রশংসাই বোধ হয় পর্যাপ্ত নয়। তার ফলে ব্যক্তির এবং সমাজের প্রগতির লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হলো নূতন মূল্যবোধ ; ব্যক্তি-মানসে জাগল ব্যক্তির সম্পর্কে শ্রদ্ধা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। সংরক্ষণশীল স্মার্ত এবং 'নব্য' নৈয়ায়িক-মতে সামাজিক/ধর্মীয় চলমানতার ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু, চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রে'র যে পরিবেশ তৈরি হলো, তাতে, অন্তত ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে, জাতবিচারের বিশেষ কোনো গুরুত্ব রইল না। এমন কথা অবশ্য বলা যায় না যে, চৈতন্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন, কিংবা তা ঘটিয়েছিলেন। কোথাও প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে চৈতন্যের কোনো সমালোচনার প্রমাণ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নামকীর্তনে, নগরকীর্তনে, মহোৎসবে চণ্ডাল-ব্রাহ্মণের কোলাকুলির যথেষ্ট সম্ভাবনাময় তাৎপর্য ছিল।[৮৩] অবশ্য বামাচারী ভৈরবী চক্রেও জাত-বিচার করা হতো না : 'প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ'। কিন্তু ভৈরবী-চক্র জাতীয় বামাচারী তান্ত্রিক ধর্মানুষ্ঠান ছিল গোপনীয় ; আর বৈষ্ণবদের কীর্তন মহোৎসব ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। কাজেই তার আকর্ষণ এবং প্রভাব ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। নিত্যানন্দ শূদ্রের বাড়িতে থাকতে ভয় পান নি ; চৈতন্য ব্রাহ্মণ-সমাজের গণ্ডী পার হয়ে জনসাধারণের কাছাকাছি এসেছিলেন।[৮৪] এ-সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক সত্য বিচার্য যে, বাংলাদেশে কখনো জাতপাতের লড়াই মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। দাক্ষিণাত্যে শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তির প্রচারের পরেও জাতিবর্ণের বিভিন্নতা কমে নি ; তার কারণ সেখানে ভক্তির একটা মৌল উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজতন্ত্র, এবং পুরোহিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মন্দিরকে কেন্দ্রবিন্দু করে, প্রচলিত অনার্য, বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, 'আর্য' ব্রাহ্মণদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।[৮৫] বাংলা দেশে, ঐতিহাসিক কারণে, এসব হয় নি।

বৈষ্ণব কবি পরমানন্দ লিখলেন : 'নাচিতে না জানি তমু / নাচিয়ে

৮৩. 'গৌরপদতরঙ্গিণী', পৃ. ১৯, পদ ৪ : 'হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। চণ্ডাল ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ?'

৮৪. 'চৈ-ভা', পৃ. ৬৯-৭১। ম্যাক্স ওয়েবার লিখেছিলেন : খ্রীষ্ট থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত সব জগদুদ্ধারকারী নাগরিকবর্গসমূহের সমর্থন চেয়েছিলেন (এইচ. এইচ. গার্থ ও সি রাইট মিলস (সম্পাদিত), 'ফ্রম ম্যাক্স ওয়েবার : এসেজ ইন সোসিওলজি', লন্ডন, ১৯৫৭, পৃ. ২৮৩-৮৪)।

৮৫. নারায়ণন ও কেশবন এ-সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রাগুক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গৌরাঙ্গ বলি/ গাহিতে জানি না তবু গাই।'[৮৬] এই বিখ্যাত পদের তাৎপর্য এই যে, বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগ, মানুষের স্বাভাবিক সৃজনশীলতাকে একটি ধর্মীয় ধারণা দ্বারা, প্রবুদ্ধ করল। তার ফল হলো দুটো। প্রথমত ভক্ত বৈষ্ণবগণ সাক্ষরতার জন্য ব্যস্ত হলেন, সাক্ষরতা প্রসারের জন্য সক্রিয় হলেন। সাক্ষরতা যত বাড়ল, ততই বাড়ল বৈষ্ণব কবিদের সংখ্যা; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল বৈষ্ণব গীতি-কবিতার সংখ্যা। বৈষ্ণব কবিদের প্রকৃত সংখ্যা এবং তাদের রচনার সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন।[৮৭] কিন্তু তা দুর্নির্ণেয়, কারণ, সব কবির এবং গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক সুবৃহৎ সংকলনে ২০৮ জন কবির ৩৭৮৭টি পদ সংকলিত করেছেন। কবিদের এবং তাঁদের রচিত পদাবলীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে।

লক্ষণীয়, চৈতন্যের জীবনী, বাংলাভাষায় রচিত মানুষের জীবনীসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম। এই সম্মিলিত সৃষ্টিপ্রবাহ এখনো পর্যন্ত অব্যাহত। ফলত বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি হলো। অন্য যে-কোনো মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী মিলিয়ে পড়লে, পদাবলীর আপেক্ষিক সৌন্দর্য, সুষমা, ছন্দের ও সুরতালের উৎকর্ষ তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বৈষ্ণবীয় ধর্মের তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা যেহেতু মানব-মানবী, এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাই সব লীলার মধ্যে সর্বোত্তম, তাই বৈষ্ণব কবিতার ভাব, ভাষা এবং ব্যঞ্জনা অসাধারণ মানবিকতার দ্বারা সমৃদ্ধ।[৮৮] এই 'আধ্যাত্মিক' মানবিকতার সমান্তর বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ। বাল্যলীলার, এবং অগাধ মাতৃস্নেহের যে কাব্যগীতিময় প্রকাশ পদাবলীতে দেখি তা অতুলনীয়।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ কাব্য-নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে নূতন প্রাণের সঞ্চার হলো। সেনযুগের পর থেকে সংস্কৃত নিবন্ধ রচনার মধ্যে বাঙালির সংস্কৃত-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের নিরন্তর

৮৬. 'বৈষ্ণব পদাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭, পদ ছয়।

৮৭ দ্রষ্টব্য : সতীশচন্দ্র রায়, 'পদকল্পতরু', কলিকাতা, ১৯৩১, পঞ্চম খণ্ড; 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী', উপক্রমণিকা; সুকুমার সেন, 'এ হিস্ট্রি অফ ব্রজবুলি লিটারেচার', কলিকাতা, ১৯৩৫।

৮৮. বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যাঁরা কেবলমাত্র ধর্ম খুঁজতেন, তাঁদের সমালোচনা করে লেখার জন্য দ্রষ্টব্য : বিনয়কুমার সরকার, 'দ্য পজিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি', এলাহবাদ, ১৯৩৭, পৃ. ৪৮৬।

সাহিত্য সাধনার ফলে নূতন কবিতা, নাটক, চম্পূ, নিবন্ধ, অলংকার বঙ্গীয় সংস্কৃত-চর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলল।

চৈতন্যের আন্দোলনের ফলেই সপ্তদশ শতক থেকে রাঢ়ে-বঙ্গে সর্বত্র নূতন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিকশিত হয়।[৮৯] বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্প তার বড়ো প্রমাণ। গ্রামে-গ্রামে তৈরি হলো বহু মন্দির; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দির শূদ্রদের অর্থে নির্মিত হয়। এ ঘটনা ক্রমবর্ধমান সামাজিক চলমানতার প্রমাণ রূপে বিচার করা হয়েছে।[৯০] প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পদাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল পদাবলীগায়নের কতকগুলো বিশিষ্ট ধরন, যেমন গরানহাটী, মনোহরশাহী, রেণেটী, মন্দারিণী। নানা কারণে শেষ পর্যন্ত মনোহরশাহী কীর্তনই রইল; অন্য শৈলীসমূহ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব কীর্তনের প্রভাব অষ্টাদশ শতকের শেষে, এবং উনিশ শতকে উদ্ভাবিত, কবিগান, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ, আখড়াই, 'হাফ'-আখড়াই, ঝুমুর প্রভৃতি গানের মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।[৯১] উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মধ্যকালীন বৈষ্ণব ঐতিহ্যের স্থান বিশিষ্ট ছিল।[৯২]

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অন্যতম সদর্থক ফল ছিল সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি। চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্মানীয়া মহিলাগণ বৈষ্ণব সমাজে পূজনীয়া ছিলেন, সীতা দেবীর, জাহ্নবী দেবীর, এবং হেমলতা ঠাকুরাণীর বহু শিষ্য ছিল।[৯৩] স্ত্রী-গুরু রূপে জাহ্নবী দেবী

৮৯. দ্রষ্টব্য : ডেভিড জি. ম্যাকাচ্চিয়ন, 'লেট মিডিয়াভাল টেম্পলস অফ বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭২।

৯০. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "টেম্পল প্রমোশন এ্যান্ড সোসাল মোবালিটি ইন বেঙ্গল" (ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'এসেজ ইন অনার অফ প্রফেসর নীহাররঞ্জন রায়', কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৩৪১-৩৭১) এবং এই লেখকের 'সোসাল মোবিলিটি ইন বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫৮-৬৪ দ্রষ্টব্য।

৯১. রমাকান্ত চক্রবর্তী, "বৈষ্ণব কীর্তন ইন বেঙ্গল" ('জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিকোলজিকল সোসাইটি', বরোদা, ১৭, ১, জুন ১৯৮৬, পৃ. ১২-৩০); হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া', কলিকাতা, ১৯৭১; খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কীর্ত্তন', কলিকাতা, ১৯৪৫।

৯২. 'ভি. আই. বি', অধ্যায় একুশ, বাইশ, পৃ. ৩৮৫-৪৫২।

৯৩. দ্রষ্টব্য : লোকনাথ দাস ও অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি (সম্পাদিত), 'সীতা চরিত্র', হুগলী, ১৯২৬; রাজবল্লভ গোস্বামী, 'মুরলীবিলাস', বাঘনাপাড়া, ১৮৯৫; নিত্যানন্দ দাস, 'প্রেমবিলাস', বহরমপুর সং, ১৯২২; যদুনন্দন, 'কর্ণানন্দ', বহরমপুর সং, ১৮২৯।

বৃন্দাবনে গিয়ে সম্মানিতা হয়েছিলেন।[৯৪] পরবর্তীকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে অন্দর মহলে শিক্ষিতা বৈষ্ণবীদের গৃহ-শিক্ষিকারূপে নিযুক্ত করা হতো।[৯৫] বৈষ্ণবগণ সামাজিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিশেষভাবে বৃন্দাবন দাস ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপরে জোর দেন। তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে অত্যাচারের, এবং অত্যাচারীর সম্পর্ক নেই।[৯৬] তাছাড়া, ভক্তির তত্ত্বে সদাচার প্রাধান্য পেল। অর্থাৎ, ভক্তি, চিন্তার ক্ষেত্রে কিংবা জীবনাচরণের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদী বিশৃঙ্খলা নয়; ভক্তি, বৈষ্ণব অর্থে, একটি গঠনমূলক তত্ত্ব।

উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়, গৌড়ীয় গোস্বামীদের তৎপরতায় তার কেন্দ্র হলো বৃন্দাবন। এভাবে বাংলা-দেশের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান হলো; রাঢ়বঙ্গের সঙ্গে সমগ্র ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হলো।

একথা অনস্বীকার্য যে, চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের কোনো রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। চৈতন্যের কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তার প্রমাণ নেই। তবুও দু-একটি ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাব কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রথমত, পূর্বে ধনীদের উদ্বৃত্ত অর্থ স্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হতো। বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে সেই অর্থে মহোৎসব, নামকীর্তন, নগরকীর্তন ও মেলা হতে থাকে। রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দের 'চিড়ামহোৎসবে'র ব্যয়ভার বহন করেন। পরে বড়ো বড়ো মহোৎসব হয়েছে কাটোয়াতে, মেদিনীপুরে এবং খেতুরিতে। খেতুরির উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন নরোত্তম দত্তের জ্ঞাতি-ভাই 'রাজা' সন্তোষ দত্ত। মেলা, মহোৎসব গ্রামীণ অর্থনীতিকে কিছুটা সচল করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব গুরু এবং মহান্তগণও ধনী হতে থাকেন।[৯৭]

৯৪. 'ভি. আই. বি.', অধ্যায় নয়, পৃ. ১৭৪-১৮৩।

৯৫. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলিকাতা, ১৯১৯, পৃ. ৬২; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রের সেকালের কথা', কলিকাতা, ১৯৩৩, ১, পৃ. ২০৯।

৯৬. 'চৈ-ভা', পৃ. ১৫৫: 'বিষ্ণু পূজিয়াও প্রজার পীড়া করে। পূজাও নিস্ফলে যায় আরো দুঃখে মরে॥ ...যত পাপ হয় প্রজাগণের হিংসনে। তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দনে॥ ...এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর। কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥ বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে। ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে॥'

৯৭. 'ভি. আই. বি.', পৃ. ৩৩৫-৩৩৭; ম্যাক্স ওয়েবার, 'দ্য রিলিজিয়ন অফ ইন্ডিয়া', গ্লেনকো, ১৯৬২, পৃ. ৩২৩।

দ্বিতীয়ত, দেশী ও বৈদেশিক বিবরণ থেকে জানা যায়, সতেরো শতকে কৃষির ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনে বাংলা দেশ প্রশংসনীয়ভাবে প্রাগ্রসর ছিল।[৯৮] লোকের আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ছিল ; কর আদায়কারীরা তেমন কিছু দয়ালু ছিলেন না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। কিন্তু তারপরেও এমন ধারণা হয় যে, ধর্মের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণবতা উদারভাবপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তার প্রভাব উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পড়েছিল। ধর্মীয়-সামাজিক উদারতা প্রাথমিক উৎপাদকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। এ ধারণার ভিত্তি হলো এই যে, ১৮৭০-এর পরে যে জনগণনা হয়, তাতে প্রাথমিক উৎপাদকদের বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার প্রমাণ আছে। অধিকাংশ শূদ্র-জাতি ছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন।[৯৯]

৯

যদুনাথ সরকার এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত প্রচার করেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালি এবং উড়িয়াদের দুর্বল করে ফেলেছিল।[১০০] এই মতের কোন সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং সুশীলকুমার দে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবালুতা এবং নীতিহীনতা পছন্দ করেন নি।[১০১] অন্য ধরনের ভাববাদ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বিশেষ আপত্তি নেই। সুশীলকুমার দে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বে নিহিত সদাচারের কথা মনে রাখেন নি। এ-সব ভুল এবং বিকৃত মূল্যায়নের ফলে বৈষ্ণবদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হয়ে ওঠে।[১০২]

৯৮. তপন রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর', দিল্লী, ১৯৬৯, অধ্যায় ৪, পৃ. ২০৪, ২০৫, ২০৯।
৯৯. এইচ এইচ রিজলী, 'দ্য ট্রাইবস এ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল', কলিকাতা, নূতন সং ১৯৮১, দুই খণ্ড, ১, পৃ. ৪৪২।
১০০. যদুনাথ সরকার, 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', মুসলিম পিরিয়ড, পাটনা সং. ১৯৭৭, পৃ. ২২২ ; আর ডি ব্যানার্জী, 'হিস্ট্রি অফ ওড়িষ্যা', কলিকাতা, ১৯৩০-৩১, দুই খণ্ড, ১, পৃ. ৩৩০-৩১, ৩৩৬।
১০১. এস. এন. দাসগুপ্ত, 'এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি', ১৯৬১ সং, ৪, পৃ. ৩৮৯ ; এস. কে. দে, 'আর্লি হিস্ট্রি অফ দ্য বৈষ্ণব ফেথ এ্যান্ড মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া', কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৫৪৬।
১০২. দ্রষ্টব্য : কে এল দত্ত ও কে এম পুরকায়স্থ, 'দ্য বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম এ্যান্ড মডার্ন লাইফ', কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৮৪-৯৮ ; একজন বৈষ্ণব লেখক লিখেছিলেন : 'সর্বোচ্চ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন' (ভক্তি প্রদীপতীর্থ, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', মাদ্রাজ, ১৯৪৭, দ্বিতীয় সং, পৃ. ১)।

তাই বৈষ্ণব ইতিহাসতত্ত্ব নূতনভাবে বিচার্য। চৈতন্যের আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল সদর্থক ফলসমূহ সহজেই চোখে পড়ে; কিন্তু তা সর্বভাবেই সার্থক হয় নি। তার বহু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল। এগুলো এখন সংক্ষেপে আলোচনা করি।

প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্রমশ তাঁদের প্রাধান্য দুষ্প্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। 'গোস্বামী শাস্ত্রে' তাই প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ভাষা সংস্কৃত; প্রমাণ, পৌরাণিক; তত্ত্ব, বৈদান্তিক; রসের বিচার, প্রাচীন রসশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল; স্মৃতি, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির বৈষ্ণবীয় রূপ।

দ্বিতীয়ত, 'মধুর ভাব' এবং 'মধুর রস' প্রভৃতি যৌনতাগ্রস্ত চিন্তাধারার পরিণাম ভালো হয় নি। 'মধুর ভাব' থেকেই এল রাধাকৃষ্ণলীলার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। তাতে ভক্তির যা কিছু সামাজিক অর্থ ছিল, তা অবলুপ্ত হলো। অন্যদিকে সন্ন্যাসের উপরে জোর দেওয়া হলো। তার ফলে, চৈতন্যের আন্দোলন যুক্তিহীন হয়ে পড়ল। একদিকে সন্ন্যাস, কঠোর তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, উপবাস। অন্যদিকে সর্বদা কৃষ্ণের যৌনলীলার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। নিত্যানন্দের দাস্যভাব, 'মঞ্জরী'-উপাসনায় 'দাসীভাব' হয়ে দাঁড়াল। ব্রজের 'মঞ্জুরী উপাসনা'র মাহাত্ম্য ঘোষিত হলো। মঞ্জুরীভাবভাবিত বৃদ্ধ বৈষ্ণব শাড়ি পরে দাসী সাজলেন।[১০৩] এককথায়, বৈষ্ণব রহস্যবাদের কোনো পার্থিব তাৎপর্যই রইল না।

রাধাকৃষ্ণলীলার 'মনন'কে শৃঙ্খলিত করার জন্য তৈরি করা হলো রসতত্ত্বের এবং বৈষ্ণব স্মৃতির আইন-কানুন। রসতত্ত্বের নিয়ম মেনে রচিত হলো বৈষ্ণব গীতিকবিতা; নিয়মের ও রীতির মধ্যে সংযমিত হলো কীর্তন। ফলত ক্রমশ ভক্তির উচ্ছ্বাস অদৃশ্য হলো; তার জায়গায় এল অলংকার এবং অলঙ্করণ। বৈষ্ণব কবিতা, গান প্রাণহীন হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়;[১০৪] সেখানে চণ্ডাল দর্শনজাত পাপ-ক্ষালনের উপায় পর্যন্ত বর্ণিত হয়।[১০৫]

চৈতন্যের সময় থেকে ধনী জমিদার, বণিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের বৈষ্ণব করার জন্য চৈতন্য সহ অনেক বৈষ্ণবই উদ্যোগী হন। রাজা প্রতাপরুদ্র, সনাতন, রূপ, রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অনুবর্তী হলেন।

১০৩. 'ভি. আই. বি', পৃ. ২৩৮-২৪০; হরিদাস, "সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজি", 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯১; "ললিতা সখী", তদেব, পৃ. ৩৭৪-৩৮৬।

১০৪. 'হরিভক্তিবিলাস,' পূর্বোক্ত, পৃ. ২১, শেলাক ৩৭; পৃ. ২২, শেলাক ৩৮।

১০৫. তদেব, পৃ. ১৩৮৭।

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থানের রাজা দিব্যসিংহ। সপ্তগ্রামের বণিকরা নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে চৈতন্যদাস' নাম দিয়ে দীক্ষিত করেন। নরোত্তম দত্তের শিষ্য ছিল উত্তরবঙ্গের বহু 'রাজা' এবং 'ভুঁইঞা'-দের গুরু হলেন শ্যামানন্দ, এবং শ্যামানন্দের শিষ্য, রয়নীর রাজপুত্র, রসিকানন্দ।[১০৬] পরে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবরা কাশিমবাজারের রাজবংশের আনুগত্য লাভ করেন।[১০৭] ত্রিপুরার রাজবংশ, এবং মণিপুরের রাজবংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে।[১০৮]

ব্রাহ্মণ, উচ্চশূদ্র, রাজা, মন্ত্রী, ভুঁইয়া, আমলা, বণিক — এঁরা কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্রাহ্মণ্য রূপে মুগ্ধ হন। এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্মীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। প্রখ্যাত শূদ্র গুরু নরোত্তম, এবং শ্যামানন্দ সম্ভবত খেতুরি উৎসবে 'ব্রাহ্মণত্ব' অর্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের সমতার কথা বলা হলো ; অর্থাৎ দীক্ষিত বৈষ্ণব এবং দ্বিজ ব্রাহ্মণ যে সমান, তা গুরু-মহান্তগণ প্রচার করলেন।[১০৯] এই অর্জিত ব্রাহ্মণত্বের জন্যই ক্রমশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আচারনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাঁদের ধর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ব্রাহ্মণত্বের এবং আভিজাত্যের সংক্রাম দুর্নিবার হয়ে উঠল। বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা 'শ্রীপাট'-সমূহে এবং বিভিন্ন মঠে আশ্রয় নিলেন।

১০

বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রাচীন, তান্ত্রিকতা-মিশ্রিত স্তর ছিল। সহজিয়া কবি চণ্ডীদাস এই স্তরের বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মান্দোলনের ফলে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমে যায় ; এক সময়ে বণিক এবং বৈশ্যরা তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু পরে তাঁরা বৈষ্ণব হলেন, তাঁর ফলে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীদের (মস্তক মুণ্ডনের ফলে নেড়া) দীক্ষা দিয়েছিলেন।[১১০] কিন্তু মনে হয় বৈষ্ণব হলেও নেড়া-নেড়ীগণ তাঁদের পূর্বাবস্থা ভুলতে পারেন নি।

১০৬. 'ডি. আই. বি', অধ্যায় পঁচিশ, পৃ. ২২৪-২৫৬।
১০৭. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, "সেই বিখ্যাত কান্তবাবুর দুইটি হিসাবের বই", 'ঐতিহাসিক', প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৯, পৃ. ২৮-৫৪।
১০৮. দ্রষ্টব্য : দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', কলিকাতা, ১৯৩৬, দ্বিতীয় খণ্ড।
১০৯ মধুসূদন তত্ত্বনিধি, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস', হুগলী, ১৯২৬, দ্বিতীয় সং, পৃ. ২৫৩-২৫৪।
১১০. 'ডি. আই. বি', অধ্যায় নয়, পৃ. ১৭৯-১৮৩।

প্রথম থেকেই বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ কেউ প্রচলিত মত গ্রহণ করতে পারেন নি। পরে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নামিয়ে আনেন।[১১১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য-জীবনীতে যে প্রেমতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, সহজিয়া বৈষ্ণবরা তা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে থাকেন। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মধ্যেই সহজিয়া যৌনতার অনুপ্রবেশ দেখা গেল। তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বর্ধমানের বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণবদের 'রসরাজ'-উপাসনাতত্ত্ব।[১১২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যতই জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেন, ততই এসব বৈষ্ণব 'উপ-সম্প্রদায়' সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পঞ্চাশটিরও বেশি উপ-সম্প্রদায় গঠিত হয়। বিখ্যাত উপ-সম্প্রদায় ছিল জগন্মোহনী সম্প্রদায়, কিশোরীভজন সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায়, কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রভৃতি। এ-সব সম্প্রদায়ের মূল কথা ছিল গুরুপূজা।

এইসব উপ-সম্প্রদায়ের গুরুগণ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাঁদের মত অনুসারে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এত বেশি লোক বৈষ্ণব হলো যে, 'জাত-বৈষ্ণব' নামে একটি বিশেষ জাতি তৈরি হলো।[১১৩] কট্টর মৌলবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মত প্রচার করলেন যে, 'জাত বৈষ্ণব'-রা ব্যভিচারী কুক্রিয়াসক্ত, এবং আসলে বৈষ্ণবই নয়।[১১৪]

অথচ, বৈষ্ণবতার এই 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য'-কে কোনো রকমেই অবহেলা করা যায় না। এই ঐতিহ্য শক্তিশালী ছিল বলেই ধর্মীয় ঐক্যের ধারণা শক্তিশালী হয়েছিল। সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে কখনো কখনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বলিষ্ঠ চেতনার প্রকাশ দেখা যায়।[১১৫] মুসলমান ফকির এবং বৈষ্ণব একে অপরের বন্ধু হন।[১১৬] এই ধর্মীয় উদারতার বাতাবরণে শাক্ত কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য কালী-কৃষ্ণের অভিন্নতা সম্পর্কে গান রচনা করেন।[১১৭]

১১১. দ্রষ্টব্য : ই. সি. ডিমক, 'দ্য প্লেস অফ দ্য হিডেন মুন', শিকাগো, ১৯৬৬, "নায়িকা সাধনা টীকা", পৃ. ২৩৪-২৩৫।
১১২. 'ভি. আই. বি.', অধ্যায় ষোলো, পৃ. ২৫৭-২৭৪।
১১৩ বিপিনচন্দ্র পাল, 'বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম', কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃ. ১২৯-১৩০।
১১৪ 'ভি. আই. বি.', পৃ. ৩৩৩-৩৩৫।
১১৫ ঐ, পৃ. ৩৪০-৩৪২।
১১৬ ঐ, পৃ. ৩৪২-৩৪৪।
১১৭. দ্রষ্টব্য : অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), 'শাক্তপদাবলী', ১৯৭১, নবম সং, পদ ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ২২০, ২২১, ২৬২ প্রভৃতি।

লোকধর্মরূপে যে বৈষ্ণব ধর্মের কথা আমরা জানি, তা ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নয়। তা এ-সব উপ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম, যা বৌদ্ধ সহজ ভাবধারা, হিন্দু তন্ত্র এবং কখনো কখনো সুফীবাদ-প্রভাবিত। সুফীবাদের সঙ্গে বৈষ্ণবতার ক্ষুদ্র-ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহু মুসলমান লোককবিকে চৈতন্য এবং রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীত-রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।[১১৮] বিষয়টি সম্পর্কে গভীরতর গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

১১৮. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি', কলিকাতা, ১৯৬২; গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক (সম্পাদিত), 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত', কলিকাতা, ১৯৬৬।